আফ্রিকার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ : একটি অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত

ঈপ্সিতা চন্দ

প্রসঙ্গান্তর থেকে শুরু করা যাক, ২০১৮ সালে মালয়ালাম ভাষায় একটি ছবি হয়, তার নাম ''সুদানী ফ্রম নাইজেরিয়া'', নাইজিরিয়া থেকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ কেরলের প্রত্যন্ত গ্রামে আসে লোকাল ক্লাব ফুটবল খেলতে। তার ভাষা, যাপন, আকার আকৃতি ভাবভঙ্গি কিছুই তার ভারতীয় টিমমেটদের মতন নয়, উপরন্তু তার পাসপোর্ট যায় হারিয়ে, তারপর সে চোট পেয়ে বসে যায়, থাকতে হয় টিম ম্যানেজারের নিজের বাড়িতে, তার মা ও পড়শি মাসিমার হেফাজতে। বলা বাহুল্য, তাঁরা কেউই তার কথা বোঝেন না, কিন্তু তাঁদের সেবায় ও গ্রামের মানুষের সাহচর্যে খেলার থেকেও বেশি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা, পার্থক্যের সঙ্গে মোলাকাত ও অন্য দেশের অন্য মানুষের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের কাহিনি এই ছবির বিষয়বস্তু। তা শুরু হয় নাইজিরিয়া ও সুদান যে আলাদা দুটি দেশ, সেই তথ্যকে একেবারে খারিজ করে — নাইজিরিয়ার মানুষকে সুদানী বলে ডাকার পিছনে আফ্রিকানদের রহস্যময় অস্তিত্বের ইঙ্গিত নেই বরং স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের ভারতীয়দের আফ্রিকা সম্পর্কে জানার সীমিত পরিসর। আমার বয়সী প্রৌঢ় পাঠক হয়তো এই ভূমিকা থেকে বুঝতে পারছেন আমার ইশারা কোন দিকে — গত শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতার ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন অনেক আফ্রিকান খেলোয়াড়, তাঁদের নাম সকলের মুখে মুখে ঘুরতো, তাঁদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি ফুটবলপ্রেমীর কোনও মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই — তবে বাঙালির কথা বা চিত্র বা চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁদের কোন উপস্থিতির খবর আমার অন্তত জানা নেই। বাংলায় আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদের গল্প অনেকটা একরকমই, কেরলের গ্রামের মতোই আফ্রিকার মানুষ আমাদের শহর ও গ্রামেও অদ্ভুত দ্রষ্টব্য বস্তু, কিন্তু সেই দেখার মধ্যে হয়তো কৌতূহল কম, হয়তো কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের চেহারার সঙ্গে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বন্ধুবর্গের চেহারা মেলে না, আমরা তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে উঁকিঝুঁকি মেরেই সন্তুষ্ট।

''তৃতীয়'' বিশ্বের নানা সাহিত্যকর্মের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটান মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদের মাধ্যমে। ১৯৮৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সংকলন ''তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'', প্রকাশনীর থেকে। সেখানে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশের সাহিত্য, বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করেন বাংলা ভাষার নানা সাহিত্যিক।

এই লেখার জন্য তথ্য খুঁজতে গিয়ে জানতে পাই, ছ'য়ের দশকে ডাকসাইটে পেশাজীবী ছিলেন

গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, রোজ রাতে আর্লি ডিনার করার পর তিনি পাইপ সহযোগে হাইনেম্যান প্রকাশনার আফ্রিকান লেখক শৃঙ্খলাতে ছাপা বই পড়তেন। কলকাতার গর্ভে যে রীতিমতো আফ্রিকার বীজ প্রবেশ করেছে অনেকদিন, এই কিংবদন্তি তার সাক্ষ্য।

১৯৬০ সালে আফ্রিকার কতিপয় দেশ স্বাধীন হয়েছে। নানা খাতে বয় অ্যাফ্রো এশিয়া লেখক সংহতি — সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ অনেক সমসাময়িক ভারতীয় ভাষার লেখক সোভিয়েত সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজি-ফরাসি-আরবি ভাষার ''লোটাস'' নামক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা অ্যাফ্রোএশিয়ান লেখক সংঘের মুখপত্র — মানববাবুর বইয়ের তাকে ''লোটাস''-এর কপি হাতড়ে জানা গেছে, আফ্রিকার ইংরেজিভাষী লেখকই শুধু নয়, ফরাসি, পর্তুগিজ ও উত্তর আফ্রিকায় ব্যবহৃত আরবি ভাষায়ও সাহিত্য রচনা হয়। ১৯৫৭ সালে ''আফ্রিকার হয়ে স্বাধীনতার নৌটঙ্কি শুরু করল ঘানা'' — ঘানার লেখক আমা আটা আইডু এই কথা বলেন তাঁর উপন্যাস "Our Sister Killjoy : Memories of a Black Eyed Squint"-এ, যা কিনা ২০০৯ নাগাদ অনুবাদ করেন সুচরিতা চট্টোপাধ্যায় ''আমাদের বোন আনন্দঘাতিনী'' নামে, প্রকাশক অবভাষ। আইডু একদা-ইংরেজ-শাসিত ঘানার মানুষ, তাঁর মাতৃভাষা আকান — কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশ শাসন নীতি অনুযায়ী, প্রাচীন আফ্রিকান ভাষাগুলিকে মুছে ফেলে ইংরেজিকে ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে স্থাপন করার প্রক্রিয়ার তিনিও শিকার। বস্তুত, এই গোটা প্রক্রিয়াকেই তিনি ''ম্যাস্করাড'' অথবা মুখোশের মাধ্যমে ঠকানো বলে চিহ্নিত করেছেন। উপনিবেশকালের সাংস্কৃতিক দমনের ফলে প্রাক ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য, রীতি-রেওয়াজ ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা, সবই খন্ড বিখন্ড হয়ে হারিয়ে যায় ঔপনিবেশিক প্রভুর বলশালী ''প্রগতিশীল'' সংস্কৃতির আঘাতে। সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য কারণ আকানভাষী মানুষদের লিপি ছিল না, সাহিত্য আক্ষরিক অর্থেই সহিতত্বের সাধনা, লিটারেসি বা লিখতে-পড়তে জানার দোহাই দিয়ে ''লিটারেচার'' থেকে কিছু — অনেক — মানুষকে বাদ দেওয়ার প্রকল্প নয়। লিপির অভাবে কথ্য রচনা মুখে মুখে পাঁচকান হয়। গান-বাজনা, গল্প বলার ও শোনার বিভিন্ন 'অনুষ্ঠান' অনুযায়ী শৈলী ভাগ হয়। পাঠক ভাববেন, আফ্রিকার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের সঙ্গে এসব জ্ঞানের কী সম্পর্ক? তাহলে বলি, সম্পর্ক একদম সরাসরি — শুধু তাই নয়, আফ্রিকার সাহিত্য কেন বাংলায় অনুবাদ হয়েছে (অথবা হয়নি), কখন কোথায় কীভাবে, সেই সব প্রশ্নের উত্তর ভাবতে সাহায্যও করবে আমা আটা আইডুর উক্তি — ''১৯৫৭ সালে, আফ্রিকার হয়ে স্বাধীনতার নৌটঙ্কি শুরু করে ঘানা।'' আইডু ব্যবহার করেছেন ''ম্যাস্করাড'' শব্দটা। ঘানাতে ও প্রায় সব মৌখিক ভাষা ভিত্তিক সংস্কৃতিতেই, যেখানে লিপি নেই — ''ম্যাস্করাড'' অনেক ধরনের হয়। ইংরেজিতে তা বোঝায় এক ধরনের শ্লেষ-প্রধান নাটকীয় প্রযোজনা যেখানে উদ্দেশ্য — সত্যটা ''মাস্ক'' অথবা মুখোশের পেছনে লুকিয়ে রাখা। ''মাস্ক'' কিন্তু যে কোন মৌখিক ভাষাভিত্তিক সমাজে শুধু শ্লেষাত্মক সমালোচনার নাটকীয় হাতিয়ার নয়। ''মাস্ক'' লোকাচারে, পুজোতে, এমনকি গ্রামসভার উপদেষ্টা হিসেবেও ব্যবহার হয় এইসব সমাজে। সেখানে আসল পরিচয় লুকোনোর কোন প্রয়োজন হয় না, বরং সেই মুখোশই তখন মানব-সত্তা অধিকার করে, দৈবীয় সত্তা সঞ্চার করে পার্থিব শরীরে। ইংরেজিতে ''ম্যাস্করাড'' ব্যবহার করে আইডু ইংরেজের কল্প-জগতের ভাষায় তার সীমিত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাতে ইংরেজের চাপিয়ে দেওয়া সভ্যতাকে হাতিয়ার করেই সেই সভ্যতাকে সমালোচনা করা গেছে। অনুবাদে আমাকে দুটি জগৎ পেরিয়ে আসতে হচ্ছে — আকান ভাষার জগৎ যেখানে মুখোশ-ধারণের অর্থ ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ আলাদা; এবং ইংরেজি ভাষার জগৎ, যেখানে এই একই শব্দ সংস্কৃতির খণ্ডিত, সীমিত একটা ভাগ বোঝায়, যার তাৎপর্য খানিক নেতিবাচক।

নৌটঙ্কি শব্দ ব্যবহারে ক্লেশ এবং নাটকীয়তাটুকুই বজায় আছে। হয়তো নাটককে গম্ভীর এবং

নৌটঙ্কিকে চটুল অতি-নাটকীয় ভাবাতে কোথাও শ্রেণী চেতনার বাবুয়ানি লুকিয়ে আছে, যা বাংলা ভাষায় একটু বেশিই সহজলভ্য — মাঝে মাঝে পড়তে গিয়ে সেই বোধটা আমরা হারিয়ে ফেলি। তার কারণ 'আফ্রিকা' নামক যে চিহ্ন তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা জগতে, তার সঙ্গে যুক্ত অন্ধকার, বর্বরতা, অসহায়, লিপিহীন (সুতরাং বন্য) মানুষ — আফ্রিকা আদিম সংস্কৃতির রূপক মাত্র। যদিও রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু উভয়েই আফ্রিকার প্রতি সহানুভূতিশীল, চিত্রকল্পে থেকেই যায় আঁধার, ছায়া, অজানা, পীড়িতা নারী, তা সে রোমান্টিক হোক বা আধুনিক।

''তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'' সেই প্রেক্ষাপটেই প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। কিন্তু সম্পাদক জানান যে এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে ''হরবোলা'' — ধুলো ঘেঁটে সৌরিন ভট্টাচার্য বের করে আনেন পরপর দুটি সংখ্যা, ১৯৭৭ ও ১৯৮৩, মুদ্রক বিভাবতী দাস, ঠিকানা পাম এভিনিউ-এর একটা বাড়ি। ঐ পাম এভিনিউ-এর ধারে কাছেই থাকতেন গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় যাঁর ছিল হাইনেম্যানের আফ্রিকার লেখক শৃংখলার কালেকশন।

''হরবোলা'', ''জানালা'', ''জিয়নকাঠি''-তে আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়, কিন্তু আফ্রিকার সাহিত্য হিসেবে আলাদা করে নয়। ''তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'' সম্পাদক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃতীয় বিশ্বের একটা ব্যাপক অথচ স্পষ্ট সংজ্ঞা পেশ করেন, অনায়াসে জুড়ে দেন সাহিত্যের সঙ্গে প্রেক্ষিত এবং অনুবাদক হিসেবে তাঁর প্রবাদপ্রতিম দক্ষতা। বাংলার কবি-সাহিত্যিক-চিন্তক-বোদ্ধা সকলেই অনুবাদক — শঙ্খ ঘোষ, সৌরীন ভট্টাচার্য, সমর, পিনাকেশ সরকার, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এক অজানা বিশ্ব।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে অনুবাদ করেন লিওপোলড সেডার সংঘোর, দাভিদ দিওপের কবিতা, বিরাগো ডিওপ ও সেমবেন উসমানের গল্প — এঁরা সকলেই পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগলের বাসিন্দা, তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি ওলোফ-কে ফরাসিরা পরিকল্পিত নীতি হিসেবে মুছে ফেলে তাদের অ্যাসিমিলেট অথবা আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া এই সংখ্যায় আছেন ইংরেজ উপনিবেশিত নাইজিরিয়ার লেখক সিপ্রিয়ান একোত্রন্সি, যিনি নাইজিরিয়ার শহুরে মানুষের ''অশিক্ষিত'' ''ভুল'' ইংরেজি ব্যবহার করেন, যা আসলে বাংলায় অনুবাদ হয় না, এবং সেভাবেই আমরা পৌঁছে যাই সেই প্রশ্নে — কে, কেন, কোথায় আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদ করেছেন, বাংলা ভাষায়।

প্রথমত, আফ্রিকা একটি মহাদেশ, তাতে অনেক রাষ্ট্র আছে এবং স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যেও অনেক বিবিধতা, বিভেদ ও আদান-প্রদান আছে, প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাসে যা ধরা পড়ে। ইসলাম আফ্রিকায় বহিরাগত নয় — নবীর সময় যে মুয়েজ্জিন আজান দিতেন, তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, এ্যাবিসিনিয়ন মায়ের পুত্র, মক্কার সমৃদ্ধ পরিবারের বিশ্বস্ত দাস, বিলাল। সুতরাং আফ্রিকাতেও নতুন সুফি সিলসিলা থেকে নতুন ধরনের মৌলবাদ, সবই বর্তমান। এছাড়াও, ইউরোপের তিন-চারটে দেশ তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে মহাদেশটাকে টুকরো টুকরো করে ভোগ করে উনিশ শতক জুড়ে। সুতরাং, অনুবাদের ভাষা হতে পারে একটি, অর্থাৎ বাংলা, কিন্তু যে সংস্কৃতি থেকে অনুবাদ হচ্ছে, সেটা বহুবিধ, অথবা প্লুরাল।

বস্তুত এই প্লুর‍্যালিটি বা বহুবিবিধতাকেই সাহিত্য-অনুবাদের মধ্যে দিয়ে জুড়ে, একটা অন্য বিশ্ব গড়তে চেয়েছিলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — তাঁর এই সমগ্র চেষ্টার একটা অংশই আফ্রিকার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ। বাঙালি পাঠকের কাছে তা আসতে আরম্ভ করে বিশ শতকের শেষ তিন-চার দশক জুড়ে। এই সময় আফ্রিকা থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা ফেরেন ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক — অংশু দত্ত, জ্যোতির্ময় পালচৌধুরী, কুসুম দত্ত ও ধ্রুব গুপ্ত। এঁরা দীর্ঘদিন সাব-সাহারান আফ্রিকার ইংরেজ

উপনিবেশিত দেশে অধ্যাপনা করে দেশে ফেরেন। অংশুবাবুর লেখা বই ''উত্থিত আফ্রিকা'', বাঙালি মননশীল কৌতূহলী পাঠককে ''কালো'' ঘোমটা ভেদ করার পথ বাতলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু কতজন আঁধারের মায়া কাটিয়ে সত্য ও তথ্যের আলোতে বেরোতে পেরেছিলেন, বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যায় যে আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদে এই ধরনের বই আফ্রিকার বিবিধতা এবং বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, সেখানকার দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, সবই স্পষ্ট করেছিল। এবং সেই জন্যই জ্ঞান এবং আবেগ দিয়ে আফ্রিকার অস্তিত্বকে ধরতে চেয়েছিলেন বোদ্ধা থেকে ছাত্র, সকলেই। কারণ ভাবের সাদৃশ্য বা বৈচিত্র্যের সঙ্গেই খুলে গিয়েছিল, গবেষক, অধ্যাপকদের সাহায্যে এক নতুন বিশ্ব, ইউরোপীয় নিবেশিকতার সঙ্গে বর্ণবিভেদের যোগে ভারতের মতো আরো অনেক উপনিবেশিত দেশের ইতিহাসের কাঠামোতেও যা স্পষ্ট। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিত স্পষ্ট করে সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে আফ্রিকার সাহিত্য পৌঁছে দিয়েছে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ''তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'' (১৯৮৮), ''হরবোলা'' (১৯৭৭), ''জিয়নকাঠি'' (১৯৮৮) এবং তারও আগে, নারী সংগঠন ''সচেতনা''র মুখপত্র। ''আফ্রিকা''-কে এইসব অনুবাদ একটি বৃহৎ রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষিতেই দেখিয়েছে। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্য বা অন্য উপনিবেশিত উন্নয়নশীল দেশগুলি সাহিত্যগুলির আন্তর্সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে।

১৯৯৫ সালে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকার সাহিত্য ঐচ্ছিক পাঠক্রম হিসেবে চালু হয়। অনুবাদের গল্প বলতে গিয়ে এটা বলার প্রয়োজন এই কারণে যে, সঠিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে যাপন, ভাবনা ও দর্শন ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক (বা স্বকল্পিক) সাহিত্যপাঠ সম্ভব নয়। আফ্রিকার অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন নারীমূর্তি মুছে ফেলে বাস্তবের জমিতে তার বিবিধতা, তার বর্ণাঢ্য অস্তিত্ব স্থাপিত করতে হয়। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগেও আফ্রিকার লেখকদের সঙ্গে আদানপ্রদান চলেছে, অধ্যাপক নরেশ গুহর উৎসাহে। তিনি দীর্ঘ দু দশক বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন চিনুয়া আচেবের সঙ্গে পরিচিত হয় ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য। আচেবে Jadavpur Journal of Comparative Literature-এ প্রবন্ধও লেখেন। এবার পাঠক/অধ্যাপক/ছাত্রদের উৎসাহ প্রতিফলিত হয় অনুবাদে — বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের সরাসরি আফ্রিকার সাহিত্যের বৈচিত্রের সঙ্গে সাক্ষাতে।

বাংলা ভাষা অবশ্য শুধু ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সীমিত নয় — সুতরাং বাংলায় আফ্রিকা অনুবাদ বা চর্চা ভাষার বিস্তার বাদ দিয়ে সম্ভব নয় — বাংলাদেশে আফ্রিকার সাহিত্যের চর্চা নিয়ে বিশেষ কিছু না জানলেও, এটুকু জানি, ১৯৯০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদবপুরের ইংরেজি বিভাগে নাইজিরিয়ার লেখক নাট্যকার নোবেলজয়ী ওলে সোয়িঙ্কার কাজ বিষয়ে, পিএইচডি করতে এলেন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগেও তখন আফ্রিকার সাহিত্যচর্চা চলছে, মানববাবুর দেখরেখে।

১৯৯৩ সালে অধ্যাপক ধ্রুব গুপ্তের সঙ্গে কাজল সম্পাদনা করেন ''ছায়াছন্ন হে আফ্রিকা'' — আফ্রিকার নানা ভাষার সাহিত্য থেকে বাংলা অনুবাদ, অনুবাদক ভারত-বাংলাদেশের তৎকালীন স্বনামধন্য কবি-প্রাবন্ধিক-গবেষক, প্রকাশক ''সাহিত্য প্রকাশ'', ঢাকা। সংকলন বেরোনোর সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা-আক্ষেপ ছিল — ''সেই ছায়াচ্ছন্নই রয়ে গেল আফ্রিকা?'' উত্তরই হয়তো আমাদের দেখার ভঙ্গি শুধরে দিয়ে অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪ সাল থেকে প্রযোজনা করেন চারটি সংকলন, আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদ, নাম ''আফ্রিকার আলো''। তার সম্প্রতিতম প্রকাশ ২০২৩, সহ-সম্পাদক কাজলের ছাত্র ড. এলহাম হোসেন।

১৯৯৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত ও বাংলাদেশে আফ্রিকার সাহিত্য বাংলা অনুবাদে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছে, পাঠক, গবেষক, ছাত্র বোদ্ধাদের মধ্যে আলোচনা ও মনন বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে দু দেশেই অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এটুকু বলা একান্ত দরকার, সঙ্ঘবদ্ধ ও

পরিকল্পিতভাবে আফ্রিকার সাহিত্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ বাংলাদেশের লেখকরা বেশি মাত্রায় করেছেন, যদিও বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের মধ্যে আফ্রিকা চর্চা ও পঠনপাঠন পশ্চিমবাংলায় কোনমতেই বিলুপ্ত বলা চলে না। তবে পশ্চিমবাংলায় আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক একমাত্র পৌষালী চক্রবর্তীর চিনুয়া আচেবের কবিতা অনুবাদ ''উদ্বাস্তু শিবিরের মা'' (২০২০)। বাংলাদেশে এলহাম হোসেন আফ্রিকার সাহিত্য ভাবনা ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করেছেন চিনুয়া আচেবের "Things Fall Apart" (সব কিছু ভেঙেচুরে যায়), "The Trouble With Nigeria" (নাইজিরিয়ার সমস্যা), আব্দুলরাজাক গুরনাহর ছোটগল্প, সবই ঢাকা থেকে প্রকাশিত। শিমিন মুশররাত অনুবাদ করেছেন চিমামান্ডা আদিচির নারীবাদী ইস্তাহার, প্রকাশক বাতিঘর ঢাকা, ২০২১।

১৯৯৩ সালে ''ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'' প্রকাশিত হওয়ার পর, দু দেশেই আফ্রিকার সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। Things Fall Apart-এর অনুবাদ ''ভাঙছে শুধু ভাঙছে'' নামে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশে। ১৯৯৫ সালের ''তাড়িখোর'' নামে প্রকাশিত হয় এ্যামোস টুটুওলার "The Palm-wine Drinkard"-এর অনুবাদ (সন্দেশ প্রকাশনা, অনুবাদক ডি এইচ হবিব); এই একই বইয়ের অনুবাদ সাহিত্য একাডেমিও প্রকাশ করে ভারতে, অনুবাদক ধ্রুব গুপ্ত, নাম ''তাল মদিরা মাতাল''। টুটুওলার বৈশিষ্ট্য, তিনি লেখার সময় ইংরেজি ভাষার ''শুদ্ধতাকে'' অনায়াসে তুড়ি মেরে উড়িয়ে নাইজিরিয়াতে লোকমুখে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষার যে চলতি সংমিশ্রণ শোনা যায়, সেই ভাষা এবং স্থানীয় ভাষা থেকে আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ, দুটোই ব্যবহার করেন। টুটুওলার ভাষা যে গতানুগতিক নয়, সেটা বোঝাতেই হয়তো অনুবাদক সাধু ভাষার ছোঁয়া রেখেছেন শিরোনামে — তবে সেটা প্রয়োগ হিসেবে কতটা সফল তা সেই সময়ও আলোচ্য ছিল। খালিকুজ্জুমান ইলিয়াস, ''আফ্রিকার আলো'' সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য — প্রথমা প্রকাশনা ঢাকা তাঁর করা চিনুয়া আচেবের "Arrow of God" উপন্যাসের অনুবাদ ছাপে, নাম ''দেবতার ধনুর্বাণ''। কাজল নিজে সেমবেন ওসমানের উপন্যাস "Xala" (অভিশাপ) আর চিনুয়া আচেবের ছোটদের উপন্যাস "Chike and the River" (চিকি ও নদী) অনুবাদ করেছেন।

২০০২ সালে ''অবভাষ'' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার বিষয় ছিল 'আফ্রিকা'। এর ভূমিকা লিখে দেন এনগুগি ওয়া থিয়ং' ও — মূল লেখার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য, যদি কোন বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, ছাত্র বা গবেষক আফ্রিকার সমগ্রতা বুঝে নিজের পছন্দের কবি সাহিত্যিকের লেখাকে আরও গভীরভাবে নিজের অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে জুড়তে চান, তাহলে অবভাষের ''আফ্রিকা'' সংখ্যা তাকে আফ্রিকার সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, লেখক, নারীচিন্তাবিদদের মৌলিক রচনার অনুবাদ এনে দেবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ভাষায় আফ্রিকা চর্চার যাঁরা পুরোধা, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব গুপ্ত, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাঁরা তখন ছাত্র — অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা মুখোপাধ্যায়, ঈপ্সিতা হালদার — সকলেই নিজেদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী সাহিত্য পাঠ ও অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গ, পাঠ, কথা সাহিত্য, কবিতা, গল্প, নাটক ও উপন্যাসের অংশ ছাপা হয় ''অবভাষ''-এর আফ্রিকার সংখ্যায় (সম্পাদক ঈপ্সিতা চন্দ)।

এ ছাড়া দেজ পাবলিশিং থেকে বেরোয় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''কালো মানুষের উপকথা''; ''আফ্রিকার সাহিত্য সংকলন'' বৈশাখী প্রকাশনা বিষ্ণু বসুর সম্পাদনায় পেশ করে ২০০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস নাগের আফ্রিকা সম্পর্কে লেখা দিয়ে শুরু হয় এই সংকলন, প্রেক্ষিত পরিবেশিত হয় দ্বিতীয় ভাগে, এবং বাকি বই জুড়ে আফ্রিকার গল্প কবিতার অনুবাদক হিসেবে থাকেন অরুণ মিত্র, রাম বসু, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আলোক সেন প্রভৃতি। এই সংকলনে অন্যতম আকর্ষণ উত্তর আফ্রিকার দুটি দেশের দুটি উপন্যাসের অনুবাদ। এর মধ্যে নোবেল জয়ী ইজিপ্শিয়ান লেখক নগীব

মাহমুদ এবং সুদানের লেখক তায়েব সলিহ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকার সাহিত্য পাঠ্যক্রম পড়ে যে ছাত্ররা তৈরি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সব অনুবাদকর্মে জড়িত হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সমীরণ গুহমজুমদার — তায়েব সলিহ-র উপন্যাস "Season Migration to the North" (উত্তরে দেশান্তরিত হওয়ার মরসুম) ও "Wedding of Zain" । প্রথমটি ''বৈশাখী" প্রকাশিত ২০০৫ সালের সংকলনে, দ্বিতীয়টি ২০০৯ সালে, এই ''বৈশাখী" পত্রিকারই ক্রোড়পত্রে।

পরবর্তী ভবিষ্যতের কথা তো ভবিষ্যতই বলবে — কিন্তু অতীতেরও বহু কথা না-বলা থেকে গেল। যেমন, মানববাবুর তাগিদে আমরা কতজন যে কত শত ছোট পত্রিকার জন্য কত শত আফ্রিকার কবিতা অনুবাদ করেছি, তার কোনও গোনাগুনতি করতে গেলে গবেষণার অধ্যবসায় দরকার। সমগ্র বাংলার আফ্রিকা চর্চায় অনুবাদের যে ভূমিকা, সেটা মানববাবুর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আফ্রিকার সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ বিষয়ে লিখতে বলে সম্পাদক যে আমাদের কতখানি উপকার করেছেন, সেটা নথিভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই অসম্পূর্ণ তালিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁর কাছে দাবি রাখা যায় কি? আমাদের পক্ষে কি দুই দেশের আফ্রিকার সাহিত্যচর্চায় বাংলা ভাষার ব্যবহার ও অনুবাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা সম্ভব? যার জন্য লাগবে সাহিত্যের বাস্তবিক বা material ইতিহাসের পর্যালোচনা, এই লেখা সেই উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত মাত্র।

ঈপ্সিতা চন্দ : অনুবাদক এবং হায়দ্রাবাদের ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।